গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০২১, অগ্রহায়ন ১৪২৮

অঞ্চল মালহোত্রা

বস্তুগত স্মৃতি জাদুঘর

[**অনুবাদকের ভূমিকা:** *অঞ্চল মালহোত্রা নয়াদিল্লিভিত্তিক কথ্য ইতিহাসবিদ ও লেখক। তিনি Remnants of a Separation গ্রন্থের লেখক, এবং বস্তুগত স্মৃতি জাদুঘর [মিউজিয়াম অফ ম্যাটেরিয়াল মেমরি] এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জাদুঘর নিয়ে এই নিবন্ধ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ এর নিউজলেটারের ৯০তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুগত স্মৃতি জাদুঘর ভারতীয় উপমহাদেশের বস্তুগত সংস্কৃতির একটি ক্রাউডসোর্সড ডিজিটাল ভান্ডার; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা সংগ্রহে রাখার মতো জিনিসপত্র বা বহু পুরাতন সামগ্রী এবং এর সাথে জড়িত পারিবারিক ইতিহাস এবং সামাজিক নৃতাত্ত্বিকতার সন্ধান এই জাদুঘরের উদ্দেশ্য।]*

আমি যখন কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে (মন্ট্রিল) আমার স্নাতকোত্তর থিসিস সম্পন্ন করেছিলাম তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে বস্তুর সাথে মানুষের এক প্রকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে; বিশেষ করে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বস্তুর সঙ্গে, যেগুলো এমন এক ভৌগোলিক অঞ্চলে থাকতে পারে যা দৈহিক ও কালিক উভয়ভাবেই অনধিগম্য। ২০১৩ সালে আমি একটি আন্তঃসীমান্ত গবেষণা প্রকল্প শুরু করেছিলাম। আমার প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় শরণার্থীদের সাথে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা। অভিপ্রায় ছিল, কোনো একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার অনুভূতি সেই ভূখণ্ড থেকে আগত বস্তুতে জড়িয়ে থাকে কিনা সেটা অনুধাবন করা; যদিও ভূখণ্ডটি এখন সীমানার ওপারে অবস্থিত। পরবর্তীতে এই গবেষণাটি বই আকারে প্রকাশিত হয়; দক্ষিণ এশিয়াতে *Remnants of a Separation* এবং আন্তর্জাতিকভাবে *Remnants of Partition* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বস্তুগত সংস্কৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ইতিহাস অন্বেষণের এই পদ্ধতিটি এমন অনেকের কাছে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল যাদের দেশভাগের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। এই আগ্রহের কারণে আমি ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে আমার একজন বন্ধু, নবধা মালহোত্রা এর সঙ্গে মিলে বস্তুগত স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করি।

ভৌত জাদুঘর ছাড়া এমন কিছু অল্প জায়গা আছে যেখানে বহু পুরনো বস্তুর জীবন ও জড়ত্ব একত্রে মিশে যায়। এই সব জাগতিক বস্তুর এক সহজাত দুর্ভাগ্য হলো এগুলো আর্থিকভাবে বা দৃশ্যত মূল্যবান হলেও তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই বস্তুর সাথে জড়িত গল্পগুলো সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যায়। এই বস্তুগুলোই আমাদের জাদুঘরের ভার্চুয়াল তাকে শোভা পায়: যেমন, ঠাকুরমার রান্নাঘরের একটি সাধারণ পাত্র, দূরবর্তী পূর্বপুরুষের ফ্রেমে বাঁধাই ছবি, একটি নোটবুক, অথবা এমনকি একটি ছোট গয়নার বাক্স। বস্তুগত স্মৃতি জাদুঘর দক্ষিণ এশিয়দের আমন্ত্রণ জানায় তাদের সংগ্রহে থাকা পুরনো বস্তুর ওপর নিবন্ধ ও আলোকচিত্র ইমেইল বা আমাদের পেজের মাধ্যমে জমা দেয়ার জন্য।

শুরুতে আমাদের জাদুঘরের মূল বিষয়বস্তু দেশভাগের স্মৃতিজড়িত জিনিসপত্র হলেও পরবর্তীতে আমরা একে আরো প্রসারিত করেছি। এখন আমরা এই উপমহাদেশের বা এর বাইরে বসবাসকারী অভিবাসীদের ১৯৭০-এর দশকের আগের জিনিসগুলো নিয়েও আগ্রহী।

পুরাতন জিনিসপত্রের ভাঁজে-ভাঁজে, কিনারায়-কিনারায়, পরতে-পরতে অতীতের এমন সব গল্প ও গন্ধ লেগে আছে যা লেখক হয়তো কখনও জানতে পারেন না বা পরিবারের লোকের কাছেও অজানা। কথ্য ইতিহাস ও পারিবারিক সাক্ষাৎকারের যে প্রক্রিয়া প্রতিটা প্রবন্ধে রূপায়িত হয়েছে সেটা নিশ্চিত করে যে, এই বস্তুগুলো বহু প্রজন্মের প্রতীক হয়ে ওঠে, সক্রিয় সংলাপে উৎসাহিত করে এবং লেখালেখিটা প্রায়শই একটি গভীর সংবেদনশীল অনুশীলনে পর্যবসিত হয়। প্রবন্ধ বা লেখা জমা হবার পর, আমরা সেই বয়ানকে আরও স্পষ্ট ও সাবলিল করতে লেখকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি। এরপর, উভয় পক্ষের সর্বোচ্চ সহযোগিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত লেখাটি প্রস্তুত হয়, যাতে শুধুমাত্র বস্তুর ভৌত ও বাহ্যগত বিবরণই না, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের স্মৃতি ও সামষ্টিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়।

উপমহাদেশীয় বিবাদপূর্ণ সীমানা অঞ্চলে ইতিহাস এক অমীমাংসিত বিষয় হিসেবে রয়ে গিয়েছে। আমাদের এই জাদুঘর এমন এক পরিসর তৈরি করতে চায় যা হবে সীমানাবিহীন মুক্তমঞ্চ; যেখানে জাতীয়তা, নাগরিকত্ব, ধর্ম, বর্ণ ও জাতপাত নির্বিশেষে সবকিছুর উর্ধ্বে সবাই সংলাপে যুক্ত হবে। অর্থাৎ এই জাদুঘর একই সাথে ডিজিটাল ও ক্রাউড-সোর্সড

সংগ্রহশালা, [*অর্থাৎ যেখানে সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বহু লোকের কাছ থেকে তথ্যাদি যোগাড় করা হয়-অনুবাদক*]। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এটা এমন এক পরিসর যা একটি অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাস বলার গণতান্ত্রিক মঞ্চ হিসাবে কাজ করে।

কস্তুরি মুখার্জির পরিবারে প্রজন্মান্তর ধরে ব্যবহৃত বটি

এর একটি আদর্শ উদাহরণ হলো বাঙালির বটি। আসানসোলের কস্তুরী মুখার্জি লিখেছেন "এটি ভারতীয় রান্নাঘরের, বিশেষ করে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় ব্যবহারিক একধরনের যন্ত্রবিশেষ, যা বিভিন্ন দ্রব্যাদি কাটাকাটি করতে ব্যবহৃত হতো।" তার লিখিত নিবন্ধে বলা হয়, কীভাবে বটির সাথে নারী ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি আইকনোগ্রাফির একটি আদর্শ রূপ হিসেবে হাজির হয়। মুখার্জী এই বিশেষ যন্ত্রের মাতৃস্থানীয় ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তার প্র-প্র-প্রমাতামহ থেকে শুরু করে একেবারে নিজের রান্নাঘর পর্যন্ত। আর এই গল্পের পাঠক প্রতিক্রিয়া ছিল কল্পনাতীত।

এটি প্রকাশিত হওয়ার পরে, উপমহাদেশের আনাচে কানাচে থেকে এটাকে কেন্দ্র করে আরো স্মৃতি এসে জড়ো হতে শুরু করে। সেখানে এই বটি কোন অঞ্চল কীভাবে নামে পরিচিত সেটাও ফুটে ওঠে: উড়িষ্যায় *পঙ্খী বা পানিকি*, পাঞ্জাবের *দান্তি বা দ্রান্তি বা দাতা*, নেপালে *চুলেসি*, অন্ধ প্রদেশে *কাঠি-পিটা*, উত্তর প্রদেশে *হাসিয়া*, বিহারে *হাঁসু বা পেহসুল*, ছত্তিসগড়ে *পাসুলি*, মহারাষ্ট্রে *পৌশি বা ভিলি*, তামিলনাড়ুতে *আরুভামানাই*, আসামে *নোপাক*, সিলেটে *দা*, কেরালায় *চিরাভা*। আমরা আরও জানতে পেরেছি যে মাছ, মাংস, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ধরনের শাকসবজি বা ফল এমনকি নারকেলের মতো বিশেষ জিনিসগুলোর জন্য বটির ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন ছিল; এক কাজের জন্য ব্যবহৃত বটি কখনো অন্য কাজে ব্যবহার করা হত না। এই বস্তুটি (বটি) উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বসবাসকৃত মানুষের জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল, এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত ট্যাপেস্ট্রি আমাদের প্রকল্পের উদ্দেশ্যকেই প্রমাণ করেছিল।

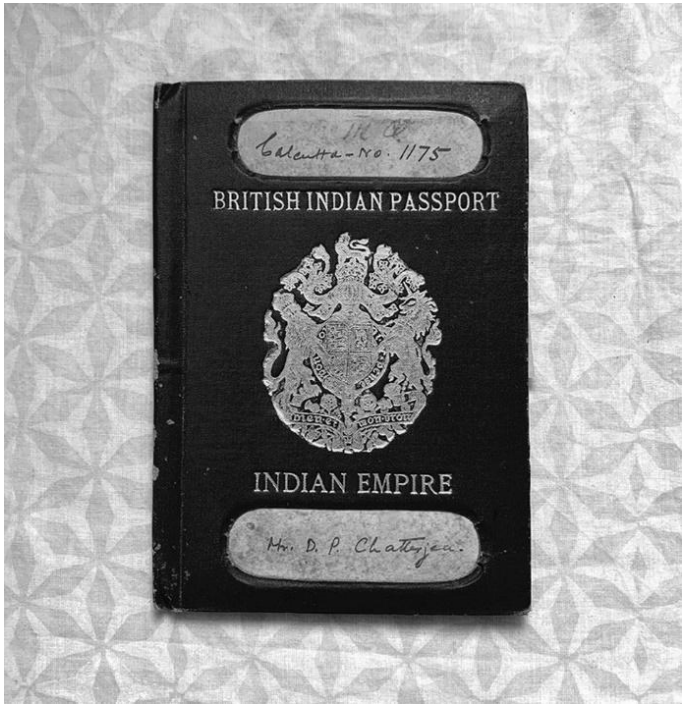

রজিতা ব্যানার্জির প্রপিতামহের ব্রিটিশ-ভারতীয় পাসপোর্ট।

জাদুঘরে জমাকৃত গৃহস্থালী সামগ্রী, বুনন সামগ্রী, ফটোগ্রাফ, গয়না, নথিপত্র এবং মানচিত্র, উত্তরাধিকার ও সংগ্রহযোগ্য সামগ্রী এবং শিল্প ও বই সহ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। তদপুরি, বহু বিচিত্র বস্তুর গল্প একটি একক বর্গে প্রদর্শিত হতে পারে। যেমন, নথিপত্র এবং মানচিত্র *My Great-Grandfather: A British Subject by Birth* শীর্ষক নিবন্ধকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। লিখেছেন কলকাতাভিত্তিক রজিতা ব্যানার্জি। ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ ভারতীয় পাসপোর্টের মাধ্যমে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকা ব্যক্তিদের কীভাবে ভ্রমণ নথি এবং সনাক্তকরণের পদ্ধতিগুলি জারি করা হয়েছিল সে সম্পর্কে লিখেছেন তিনি।

এছাড়াও লাহোরে জন্মগ্রহণকারী, দুবাইয়ের সাবা কিজিলিবাসের *Aghajan's Cheque Book* আছে, যেখানে ভারতের ইম্পেরিয়াল ব্যাংকের মূল্যবান নথি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই নথি তার ঠাকুরদাদা ভারতের ১৯৪৭ দেশভাগের পর শ্রীনগর থেকে পাকিস্তানের লাহোরে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেশভাগের পর নয়াদিল্লিতে দশমাসের কারাভোগের পর তিনি যান। চেকবুকটি সাবার কাছে তার বিয়ের দিন প্রদানের জন্য উইল করা হয়েছিল।

সাবা কিজিলিবাসের দাদার চেকবই

তৃতীয় গল্পে, কেরালার অমিত পল্লাথের *News from Ceylon: 1942*; সিলন (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) থেকে কেরালার ত্রিসুরে পরিবাররের উদ্দেশে দাদার পাঠানো একটি চিঠির বিষয়ে সেখানে বর্ণনা করা হয়। কাজের উদ্দেশ্যে সিলনে তিনি প্রায় আট বছর ছিলেন, পরিবারের জন্য বাড়িতে নিয়মিত অর্থ প্রেরণ করতেন। চিঠিটি ব্রিটিশ শাসনের সময়ে অভিবাসী শ্রমিকদের কষ্ট তুলে ধরেছে: আমাদের খাদ্য রেশন দেয়া হতো, সপ্তাহে প্রায় ৬০০ গ্রাম পেতাম [সেখানে *নাজি* ব্যবহার করা হয়েছে। এক *নাজি* দিয়ে ২০০ গ্রাম বোঝানো হয়- অনুবাদক]।

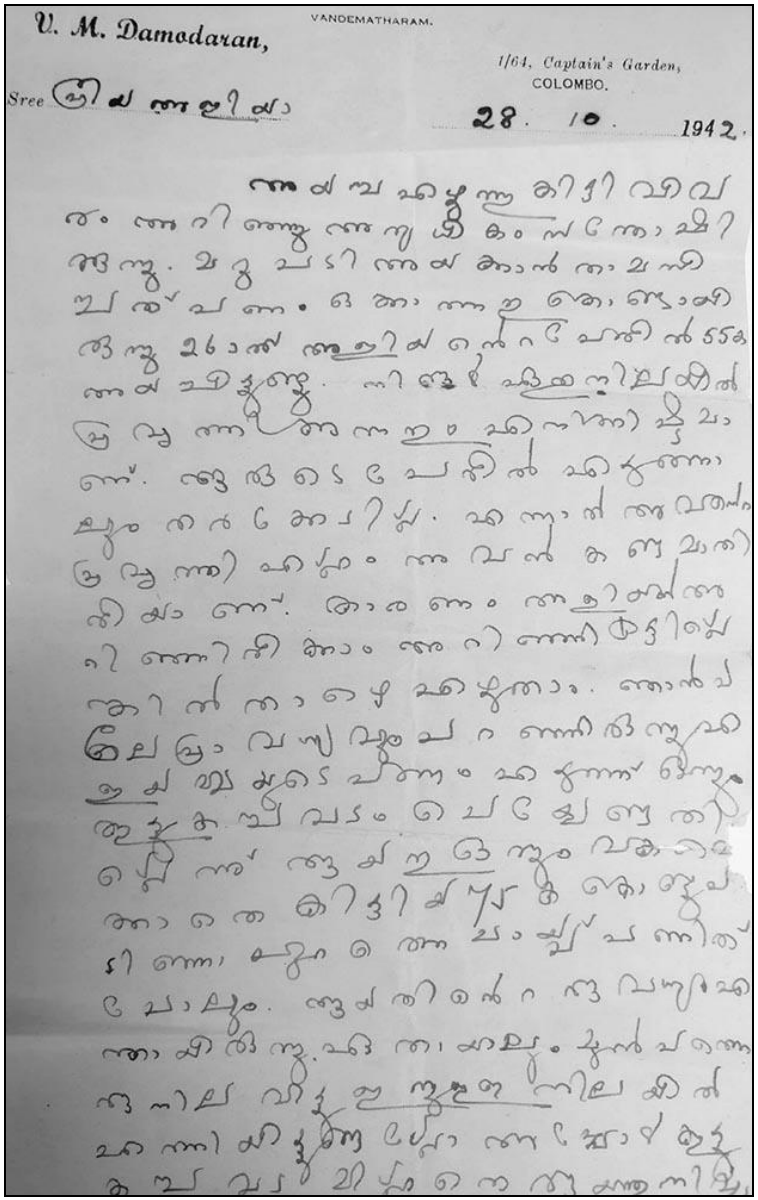

অমিত পাল্লাতের দাদার লিখিত চিঠি

কখনও কখনও এমন হয় যে, পরিবারের কাছে পার্থিব বলে বিবেচিত বস্তু ইতিহাসের একটি বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসাবে হাজির হতে পারে। যেমন দেখা যায় ইন্দোরের সাহিবা ভাটিইয়ার ক্ষেত্রে। *Souvenir from the Trenches of World War One* -তে তিনি তার ঠাকুরমার পিতলের গয়নার বাক্স খুঁজে পান, যেটা দেখা যায় প্রিন্সেস মেরির ক্রিসমাসের উপহার বাক্স। ১৯১৪ সালে সকল ফ্রন্টের নাবিকদের এটা উপহার দেয়া হয়েছিল। অবিভক্ত ভারত থেকে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন সৈনিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল। ভাটিয়া জানতে পেরেছিলেন যে তার ঠাকুরমা এই বাক্সটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তার মায়ের কাছ থেকে, যার দত্তক পিতা ব্রিটিশদের জন্য সামরিক সরঞ্জামের একজন ক্রেতা এবং বিক্রেতা ছিলেন। তিনি এই ক্রিসমাস বক্সটি সেই সময়ের একটি মূল্যবান নিদর্শন হিসাবে সংগ্রহ করেছিলেন। ঠিক সেই সময়েই যখন এই নির্দশনটি জাদুঘরে দেওয়া হয়, আমি তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি বইয়ের উপর কাজ করছিলাম এবং প্রিন্সেস মেরির ক্রিসমাস বক্সের উপর বেশ কিছু গবেষণাও শেষ করেছিলাম। তাই চূড়ান্ত প্রকাশিত লেখাটি ভাটিয়া এবং আমার মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক পাঠ; সেখানে তিনি সেই নিদর্শনের একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেছিলেন, এবং আমি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি।

সাহিবা ভাটিয়ার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া উপহার বাক্স

বস্তুগত স্মৃতি জাদুঘরে সর্বাধিক জনপ্রিয় অংশ হচ্ছে প্রদর্শিত গয়নার অংশ; আমরা প্রায়শই এমন কিছু জিনিস পাই যেগুলি দেখতে প্রায় একই রকম হলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস উপস্থাপন করে। দিল্লিভিত্তিক প্রভদীপ সিং মাথারুর *A Spared Pair of Payal* এবং শ্রী মুক্তাসার সাহিবের খুশভিন ব্রারের *Heirlooms from Faridkot* দেখে প্রথমে মনে হতে পারে, দুটো গয়নার জহুরি বুঝি একই। [চিত্র ৬ ও ৭] কিন্তু মাথারুর গল্প শুরু হয় ১৯৪৯ সালে কাপুরথালা জেলায়, যখন এই পায়েল/ তার ঠাকুরমার সাথে দিল্লিতে সফর করে। তাদের মৃত্যুর কয়েক দশক পর, পারিবারিক সম্পদ ভাগ বাঁটোয়ারার সময়ে, মাথারুর মা তার শাশুড়ির শেষ স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার জন্য এই নুপুরের অর্থমূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য দেন। অন্যদিকে ব্রারের গল্পটি ফরিদকোটে ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানে তার প্রপিতামহ তার বিয়েতে কনের সাজসজ্জার অংশ হিসাবে পায়েলটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে চলে যায়। উভয় গয়না এক ধরনের অভিন্ন নকশা বহন করে চলছে, তাদের ওজন ও দৈর্ঘ্যই সমান, এবং দুটোই সময়ের সাথে সাথে কালচে হয়ে যাচ্ছে। যার যার ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও দুই পরিবারই তাদের অতীতকে এই পায়েল বা ঘুঙ্গুর বা নুপুরের মধ্যে আটকে রেখেছে।

মাথারুর পায়েল

ব্রারের /পায়েল

যদিও ভার্চুয়াল জগত কারো কারো কাছে এগুলোকে নৈর্ব্যক্তিক মনে হতে পারে। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে জাদুঘরে আমাদের প্রচেষ্টা কেবল অতীতের সাথে একটি ব্যক্তিগত সংযোগই স্থাপন করে না, বরঞ্চ আমাদের পাঠক ও লেখকদের মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং স্মৃতির প্রতি গভীর আকুলতা এবং গর্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এটা একইসাথে মিলে সামষ্টিক ইতিহাস ও স্মৃতিকে তুলে ধরতে পারবে।

অনুবাদ : রিফাত ফারজানা

বই পরিচিত / পর্যালোচনা

আহম্মেদ শরীফ, মামুন সিদ্দিকী

গণহত্যা নির্ঘণ্ট ও জরিপ পরিচিতি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধানতম দিক গণহত্যা-নির্যাতন। পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশিয় দোসরদের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস দেশের প্রতিটি জনপদ ও অঞ্চলে অত্যাচার-নিপীড়নের পর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে গণহত্যা সংঘটিত করে। কিন্তু বিজয়ের গৌরবের কাছে সেই সব কষ্ট ও বেদনার কথা ইতিহাসে সবিশেষ উঠে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় গণহত্যা নির্যাতন, গণকবর ও বধ্যভূমির কথা অনেকটা উপেক্ষিত হয়েছে।

এমনও গণহত্যা রয়েছে, এমনও বধ্যভূমি রয়েছে যার সম্পর্কে সামান্য তথ্যই উদঘাটিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা অজানাই রয়ে গেছে। বিষয়টি উপলব্ধি করে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন একেকটি গণহত্যার উপর পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খুলনায় স্থাপিত '১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর', ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী এবং পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প হিসেবে জাদুঘরের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র' থেকে এ পর্যন্ত ১০০টি গ্রন্থ বের হয়েছে। প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে আরও বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ।

গণহত্যা নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালার সম্পাদক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। গ্রন্থমালার সহযোগী সম্পাদক মামুন সিদ্দিকী। প্রথম ১০টি গ্রন্থ বের হয়েছিল ডিসেম্বর ২০১৪-এ। রায়ের বাজার বধ্যভূমির অতি পরিচিত গণহত্যার চিত্রটিকে অনন্য রূপে ব্যবহার করে প্রচ্ছদ করলেন তারিক সুজাত। গণহত্যা-নির্যাতনের আলোকচিত্র, দলিলপত্রের ছবি, শহিদ, প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্যাতিতদের ছবি দিয়ে সাজানো গ্রন্থমালা সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। অনেকেই এ রকম গ্রন্থ রচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। গণহত্যা নির্ঘণ্ট গ্রন্থ ঘরে বসে লেখার সুযোগ নেই। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে গণহত্যা-নির্যাতনের পুরো